প্রশ্ন:- মুকুন্দরামের চরিত্র পরিকল্পনা —

প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকে যে সকল গুণের জন্য শ্রেষ্ঠ কবি রূপে চিহ্নিত করা হয় তাদের মধ্যে তাঁর চরিত্র সৃষ্টিতে (নিপুণ) অন্যতম হিসেবে গ্রহণ করা হয়, সমালোচকদের মতে তিনি সফল উপন্যাসিক না হয়ে ঔপন্যাসিক হতেন। উপন্যাসের অন্যতম উপাদান হল চরিত্র সৃষ্টি। মুকুন্দরামের চরিত্র গুলি তাঁর মানব চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার ফল। সুতরাং তাঁর কাব্যে চরিত্র সৃষ্টি সার্থক হয়েছে। এই কারণেই তাঁকে ঔপন্যাসিকের মর্যাদা দেওয়া হয়। সার্থক চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাস্তবতা ও নির্মমতা এই দুইটি গুণ অত্যন্ত এ বিষয় প্রমথনাথ বিশী বলেছেন — 'বাস্তবনিষ্ঠার সঙ্গে তার নির্মমতা, আধুনিক ঔপন্যাসিক নিজের নাক বরাবর চলিতে থাকেন তার ফলে তাহাকে যেখানে লইয়াই যাক যেতেছে না কেন, তাহার দৃক্‌পাত নাই — ইহাকে বলি নির্মমতা, সমস্তবুদ্ধি দৃষ্টি, অভিপ্রায়কে সংযত করিয়া লেখক বাস্তব সংসারকে অনুসরণ করিয়াছে, সংসারের বাস্তব ধর্মকে ইহারই নাম, ... কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে বাস্তবনিষ্ঠা ও নির্মমতা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান।'

চণ্ডী মঙ্গলের প্রথম খণ্ড দুইটি পাঠ, দেবখণ্ড ও আখেটী খণ্ড। দেবখণ্ডের চরিত্র গুলি সবই অপ্রাকৃত দেব, দেবী, মহাদেব, উমা, মেনকা প্রভৃতি। তবে এই চরিত্র গুলিতে অলৌকিক যেমন আছে তেমনি লৌকিক উপাদানও কম নেই। বিশেষত উমা, মহাদেব ও মেনকার চরিত্র মানবিক দোষ গুণ এমন ভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে এই চরিত্র গুলি যেন সমাজের নিম্ন শ্রেণীর সংসারের মানবচরিত্র বলে মনে হয়, কিন্তু এই চরিত্র গুলো অলৌকিক বলেই আমাদের অন্তরে গভীর রেখাপাত করে না, আর আখেটী খণ্ডে আমাদের দেশের বলে চিনতে হয় ছোট চরিত্র — কালকেতু, ফুল্লরা, ভাঁড়ু দত্ত, ধনপতি সদাগর।

মহাকাব্যিক ও অভিজাত বীর, কর্তব্য পরায়ণ ও আত্মবিশ্বাসী পুরুষ রূপে উপস্থিত করেছেন।

কালকেতু আসলে শালপ্রাংশু দেবতা — পূর্ব জন্মে যে ছিল ইন্দ্র পুত্র নীলাম্বর, মর্তলোকে গৌরী দেবীর পূজা প্রচার করবার জন্য তাকে মর্তলোকে ব্যাধ হয়ে জন্ম নিতে হয়েছিল। এমন মহাকাব্যিক কালকেতু পিতা ধর্মকেতু কর্তৃক মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে লাগল। কবি যথাযথ উপমার সাহায্যে কালকেতুর দৈহিক গঠন বর্ণনা দিয়েছেন। —

'বাহু যুগ জানু কান কুম্ভে যেন হিমবান
দুই সব লোহার সাবল॥'

কালকেতুর দৈহিক বর্ণনায় কবি পৌরাণিক উপমায় প্রাণ সঞ্চারিত করেছেন —

'কপাল বিশাল বক্ষ বিনিন্দি ইন্দীবর চক্ষু
আকর্ণ দীঘল বিলোচন॥'

এমন আত্মসচেতন কালকেতু অনেক আগেই মানুষ করে তার ভবিষ্যৎ জীবনের পরিচয় দিত, তবু তিনি বড় পাত্র হবেই 'ভাল্লুক কাত দিঁ কালকেতু ভুলে।' শ্রীমন্ত 'পিঞ্জর মধ্যে সোভন'। তাই কালকেতু উপর পৌরাণিক আখ্যান ধারা শ্রীকৃষ্ণের খানিকটা ছায়া পাত হয়েছে। তার এমনিতর শক্তি সামর্থ্যের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর সন্ধানে প্রত্যক্ষ করা যায়, কবিকঙ্কণ তাঁর কাব্যের নায়ককে প্রাচীন আদর্শ অনুযায়ী পৌরাণিক মহাকাব্যের বীরদের মতো করে এবং বিশেষ করে মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের মতো করে গড়ে তুলেছেন। আত্মবিশ্বাসেই কালকেতু সব দিক থেকে পরিচিত হয়ে উঠেছে, শক্তি শিকার এবং ইন্দ্রিয়সুখ যে কোনো অর্জন করেছে, তাই পিতামাতার বিবাহের পর তিনি বড় হয়ে উঠেছেন। ঘটক সোমাই তার যোগ্য পাত্রীর উদ্দেশ্যে সঞ্জয় ছেড়ে ঘরে গিয়ে কালকেতুর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছে —

~~[illegible]~~
অর্জুন সমান তার ইন্দ্রের ~~[illegible]~~ ॥ যেমতি ॥

এখানে অর্জুন তুল্য খ্যাতিমান বীর কালকেতুর সঙ্গে তিনি যে মহাভারতের কথা সুস্পষ্ট, এখানে বিবাহের যে রমণী তা আর উপাদান সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে না, কিন্তু বিবাহের ক্ষেত্রে বিয়ের প্রথা সমস্তই বৈদিক বিধি নির্দেশানুযায়ী, এখানে উচ্চবর্ণ কুলীন সামাজিক অনুষঙ্গেরই প্রাধান্য। তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে কবি শ্রীমন্তের কুল সম্পর্কে বিশেষ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না, কিন্তু কাব্যের ভাবের অনুসারে তার যে অভিজাত্য ইঙ্গিত তার সঙ্গে মিলে রেখেই বিয়ে হয় কিভাবে পরিকল্পনা এই তাঁর করেছেন।

আপাত দৃষ্টিতে তাকে অত্যাচারী রূপে বলতে প্রজাদের মনে রাখতে হয় যে সে স্ত্রী, জীবন নিয়ন্ত্রণ তাদেরই তাকে শিকার করতে হয়। অত্যাচারিতা তার স্বভাব ছিল না। কারণ পাছে সে যখন রাজা হয় তখন কৃষকদের প্রজাদের প্রতি তার স্ত্রী সদয় ছিল যথানুচিত হয়, তখন তার চিত্রটী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

ফুল্লরা প্রতি কালকেতুর প্রেম বর্ণনায় সংযম হারা সাধিতা, সেকালে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল কিন্তু সে যথার্থ প্রেমিক স্বামীর মতই ফুল্লরাকে নিয়েই সুখী, তার মনে কোন অতৃপ্তি ছিল না। তাই ছোড়শী কন্যা রূপিনী চণ্ডীর আগমনে তাদের সুখের নীড় ভেঙে যাবার আশঙ্কায় ফুল্লরাকে যখন সে কাঁদতে দেখল তখন সে বিস্ময়াপন্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে —

'সাগুতী নাই নদী নাই নাই তোর সখা,
কার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কৈলি রাতা॥'

তখন ফুল্লরা তাকে তার অতীন আচরণের জন্য দোষারোপ করে, কালকেতু দুঃখিত কণ্ঠে জানায় —

'অতি শিশুকালে পিতা করিনু তোমারে.....
পাছে রমনী দেখে হেঁট করি মাথা
তবে কেন এত মোরে কর কটুকথা॥

তারপর যখন সে সত্যই তার সুন্দরীকে দেখে যে এতই ক্রুদ্ধ হয় যে বিষুক দিয়ে তাকে হত্যা করতে প্রস্তুত হয়, এর পর দেবী নিজরূপ ধারণ করে কালকেতুকে অনেক ধনসম্পদ দান করেন। দেবী প্রদত্ত ধন নিয়ে কালকেতুর পিছনে পিছনে দেবীও চলতে থাকেন তখন সাথে সাথে কালকেতু পিছন ফিরে তাকায় — যখন

মনে মনে কলিঙ্গরাজ করেন যুকতি,
ধন ধরা দিয়ে পাছে পালায় পার্বতী॥

যিনি অনাদিকাল হতে দান করে তাঁর ভয় দিয়ে পালানোর কোন প্রয়োজন হয় না এই কথা সত্য টুকু সেকালে বুঝিতে কালকেতুর ছিল না, এতে তার ব্যক্তিত্বের সারল্যের পরিচয় পাওয়া যায়,

কালকেতু ভোজনরত রাজাকে তাড়িয়ে দেবার পর ভাঁড়ুদত্ত কলিঙ্গরাজকে কালকেতুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে যুদ্ধে সমস্ত করায়। কলিঙ্গরাজ হার মানি হয়ে আবার কালকেতুর কাছে যায় —

আজ থেকে কিছু ভাল এত বলে পালাই গেলা
বিনয়ে মানিল কালিঙ্গ কালিঙ্গ॥

হয়ে যাওয়ায় সে চরম অপমানে ক্ষেপে ওঠে। তাই কালকেতুকে বলে —

'তিন গোটা কর বিদায় একগোটা কাল
হাট হাটে হাটে ফুল্লরা পসরা বিকিত মাস।'

এর পর ভাঁড়ুদত্ত গুজরাট রাজকে কালকেতুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার জন্য প্ররোচিত করে। কিন্তু পরাজিত হল ভাঁড়ুদত্ত। ভেড়া অলঙ্কার করে সৈন্যদের আবার যুদ্ধে পাঠাল, সৈন্যদের আবার প্রত্যাবর্তনে বিমুখ হয়ে ফুল্লরার নির্দেশে কালকেতু — 'লুকাইল বীর চিন ঘর'। কিন্তু তার দুর্মতির শেষ পর্যন্ত কালকেতু বন্দী হল। পরে আবার যখন সে কালকেতুর রাজসভায় উপস্থিত হল তখন সেখানে চেষ্টা করল যে তার সমস্ত কাজই কালকেতুর মঙ্গলের জন্য। কিন্তু কালকেতু তার স্বরূপ বুঝতে পেরে যথাযথ শাস্তি বিধান করেছে —

মুকুন্দ ভাঁড়ুর মুণ্ড অভক্ষে করিয়া খণ্ড
ছইশালে দেহ কালিচুন।

তখন তাকে নিজের লম্বা জাঙ্গিয়া নামা দূরের আশ্রয় নিতে হয়।

ভাঁড়ুদত্ত কবি কঙ্কণের মৌলিক আবিষ্কার না হলেও তিনি চরিত্রটিকে এমন একটা সজীব রূপ দিয়েছেন যাঁর ফলে ভাঁড়ুর চক্রান্তেই এই উপাখ্যানের ঘটনা স্রোত উতল হয়ে পরিণামের দিকে ছুটে চলেছে। দ্বিজমাধবের রচনাতেও ভাঁড়ুদত্তের চরিত্র আছে। কিন্তু মুকুন্দরামের বর্ণনাভঙ্গী আরো সরস, ও ব্যঙ্গের তির্যক ব্যঞ্জনা আরও তীক্ষ্ণ সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী ভাঁড়ুদত্ত প্রসঙ্গে বলেছেন — "কবিকঙ্কণ চণ্ডীকে উপন্যাস না বলা গেলেও উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ দুটি তাহাতে আছে, বস্তুনিষ্ঠা ও নির্মমতা।..... কোন কোন চরিত্র চিত্রে কবি বস্তুনিষ্ঠা ও নির্মমতার চরম করিয়া দেখিয়াছেন। এমন একটি মেলে কবি, একমাত্র ভাঁড়ুদত্ত, অন্ততঃ একমাত্র মনুষ্য চরিত্র। কারণ কবি কঙ্কণ পশুসমাজের যে চরিত্র আঁকিয়াছেন তাহাও বস্তুনিষ্ঠ।" তিনি ভাঁড়ুদত্ত চরিত্রকে একান্ত মডার্ন বলেছেন। মুকুন্দরাম এই চরিত্রটিকে দিয়ে কৌতুক রসের প্রকর্ষতা ঘটিয়েছেন। ভাঁড়ুদত্তের মত এমন জীবন্ত চরিত্র মধ্যযুগীয় সাহিত্যে আর কোথাও নেই। এর জন্য অনেকটা দায়ী সে যুগের ধর্ম নিরপেক্ষিত মানুষের সচেতনতা কিন্তু প্রধানত কবির দৃষ্টি প্রতিভা। ভাঁড়ুদত্তের শিখাদত্ত নাম কি ছিল তা অজানা থেকে গেছে। তার চরিত্র গৌরব সত্যানিষ্ঠ তার আসল নামকে চিরকালের মত আবৃত করে ভাঁড়ুদত্তে তার পরিচয় [illegible] ঘোষণা করছে।

পাওনা নিয়ে যায়, এবং নানা স্তোক বাক্যে কালকেতুকে এখানের মতই নতুন বাসের প্রস্তাব করে —

'আই আজ এক ভাব হাল বাসি নিব বার
নিজে কিছু আমিহ বেড়ি ॥'

কিন্তু কালকেতুর আগমনের উদ্দেশ্য এক তাই সে জানায় —

'শুনহা শুনহা ভুঁড়ী আই কিছু আছে জেড়ি
এখুনি ভাঙ্গাড়া নিব করি।'

কালকেতুর এই কথায় ঘিনের গন্ধ পেল বেনী। যেহেতু অ্যাটির কথা শুনতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে প্রবেশ করল প্রফেসার নাইয়ি এবং তার উচ্চারিত সুর চমকপ্রদ —

'কান্যা বলে ভাইপোরে ঘৃত নাহি দেখি তোরে
এ তোমার কেমন ব্যবহার।'

কালকেতুর মনে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যই এত আত্মীয়তার ভান। সে এতই ধূর্ত যে খুব সুকৌশলে মনের অভিপ্রায়কে গোপন করে বাক্‌চাতুর্যের আশ্রয় নিয়েছে। তারপর সে অ্যাটিটি ওজন করে বলে —

'সোনা রূপা নহে বাপা এ কেবল পিতল,
ঘষিয়া মাজিয়া বাপুর করেছ উজ্জ্বল ॥'

এখন সত্যিই বিস্মিত হতে হয়। প্রফেসার অ্যাটির মূল্য অনুযায়ী মূল্য দেবার প্রস্তাব দেয় মুরারিশীল। কিন্তু কালকেতু বুঝতে পারে এই অ্যাটির উচিত মূল্য নয়। —

কালকেতু বলে খুড়া মূল্য নাহি পাই,
যেজন দিয়াছে মুহা যাই তার ঠাঁই ॥

কিন্তু মুরারিশীল তো অ্যাটির যথার্থ মূল্য বিষয় সচেতন, অ্যাটিটি নিয়ে কম মূল্য দিয়ে কালকেতুকে ঠকানোই তার উদ্দেশ্য। তাই সে অ্যাটি হাতছাড়া করতে চায় না অ্যাটির মূল্য বাড়িয়ে দেয় ও নানা কথা বলে কালকেতুর বিশ্বাস প্রমাণ তুলে তার সরল বিশ্বাস উৎপাদন চেষ্টা করে কিন্তু তাতে কালকেতুর মন ভিজলো না। মুরারিশীল মরিয়া হয়ে আর সুযোগ আর পেল না ইচ্ছা বৈ বানী বললো —

এক পাই সাত কোটি এক্কা নহে ঠিক,
বাড়িবে তোমার ঘর লক্ষ্মীজার বর ॥

এখন আবার মুরারিশীল এমন ভাব ভাল যেন সে সত্যবাদী ব্যবসায়ী। প্রকৃতপক্ষে সে শুধু পরিহাস করেছিল, কারণ মুরারি শীলের উপস্থিতি কাল পুরই অল্প কিন্তু তার মতে অতি সুন্দর ভাবে তার ধূর্ততা, মিথ্যা পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন।

ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে এই সান্ত্বনা দেয় যে সুখ দুঃখ যে কোনো অবস্থাতেই, দুঃখের মধ্যেও সুখ ও সুখের মধ্যেই দুঃখ লুকিয়ে থাকে।

"দুঃখ সুখে নাহি করো জ্ঞান, সুখ দুঃখ দুই সমান জানো।
দুঃখ সুখ যেমনতো দুঃখ তুমি সুখ সেমনতো।"

— বলে সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু এর জন্য মুক্তি পাবার জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিতে হবে। সেই মুক্তি পাবার জন্য

সুপ্রভার ভাষায় রচিত হয়েছে সত্য নারী সুলভ আবেগ এবং মধুরতা। দেবী যখন কালকেতুকে একটি নিজ দেখিয়েছিলেন তখন প্রত্যুত্তরে নিজের কথা সুপ্রভা বলে —

প্রভাতে আমারো হইত দুইত কোন কাজ,
সকলিত নাহিত পুত্র তাহার দুর্মাস।

একবিংশতা প্রভাত নারীর এই যে বেদনা প্রকাশে সুন্দর নির্মাণে এমন কিছু নয় এবং এবিষয়ে তা বেশ মনোবিকাশের বলেই মনে হয়। সুপ্রভার এই সরলতা ও নিষ্ঠুরতা নির্মাণের জন্যই কালকেতুকে অনিবার্য করেছে তাদের বিয়ে পরবর্তে বহুদূর।

সুপ্রভার চরিত্রটি নারী মহিমা হিসেবে অবশ্যই সুবর্ণময় নারী হিসেবে তাঁর নয়। সুপ্রভার সেবা যত্ন পেয়েছে যেখানে অবশ্যই নারীর প্রয়োজন ছিল ফুল্লরাদের তাঁর ছিল না। যেখানে তিনি প্রকৃত অভিজ্ঞতা থেকে নিজেকে সেখানে সার্থক হয়েছে। যেখানে কালকেতু ব্যাধ ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত তেমন পরিবেশ ছিল না, গরু চোরাই প্রভৃতি কাজে জড়িয়ে পড়ার পর তাঁর হয়ে দাঁড়ায় নি। সুপ্রভা চরিত্র যে সার্থক হয়েছে। মধ্যযুগেই তিনি এক আধুনিকতা সম্বলিত একটি সুন্দর নারী চরিত্র এবং কবির কৃতিত্ব দিয়ে গেছেন।